শৈব সাধিকা লাল দেদ : পিতৃতন্ত্র, অধ্যাত্মজগৎ, বিদ্রোহ

অরিঞ্জয় বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
বাসন্তীদেবী কলেজ
Email: paapoon@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার :

খ্রিস্টীয় চোদ্দ শতকের কাশ্মীরি শৈব সাধিকা লাল দেদ ছিলেন এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। পিতৃতন্ত্র নির্ধারিত নানা সামাজিক-বিধি তিনি সে-যুগে লঙ্ঘন করেছিলেন। অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করেও নিয়মের ঘেরাটোপে আটকে থাকেননি। শৈবাদ্বৈতবাদী দর্শন আত্মস্থ করে জগৎ-সংসারকে আপন করে নিয়েছিলেন তিনি। সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ত্রিক শৈবদর্শনের সারকথা। সহজ-সরল মানুষের মুখের ভাষা কাশ্মীরিতে রচনা করেছিলেন অদ্বৈতবাদী ত্রিকদর্শনে সমৃদ্ধ কবিতা। দীর্ঘ ছ'শো বছর পেরিয়ে আজও কাশ্মীরের মানুষ লাল দেদকে ভোলেনি। কাশ্মীরের জনসংস্কৃতি লাল দেদ ও তাঁর কবিতার সঙ্গে এ-যুগেও একাত্ম হয়ে আছে।

সূচক শব্দ :

পিতৃতন্ত্র, অধ্যাত্মজগৎ, ত্রিকদর্শন, বাখ/বাখী।

শৈব সাধিকা লাল দেদ : পিতৃতন্ত্র, অধ্যাত্মজগৎ, বিদ্রোহ

লাল্লা বা লাল দেদের জন্ম যে চোদ্দ শতকের প্রথমদিকেই হয়েছিল— সে কথা এখন স্বীকৃত সত্য। তবে এই পৃথিবীতে ঠিক কেমন জীবন তিনি কাটিয়ে গিয়েছেন, সেসবগুলো খুব স্পষ্ট করে জানাটা আজও বেশ দুরূহ। কারণ যতদিন লাল্লা বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর কথা লিখে রাখার প্রয়োজন কেউ বোধ করেননি। যার ফলে তাঁর সমসাময়িক কোনও সাহিত্য-উপাদানেই, জীবনকথা দূরে থাক, লাল্লার নামোল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। লাল্লা ছিলেন কাশ্মীরি শৈব সাধিকা, অথচ চোদ্দ শতক থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের যেকোনো সংস্কৃত সাহিত্যই তার সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চুপ। পনেরো শতকের শুরুর দিকে, কাশ্মীরে জয়নুল আবেদিনের রাজত্বকালে (খ্রি. ১৪২০-১৪৭০), তাঁর সভাকবি জোনরাজ *দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিনীতে* লাল্লার পরমশিষ্য বলে কথিত 'যাবনানাম পরমগুরু' নন্দ ঋষির কথা লিখলেও[১], লাল্লা সম্পর্কে একটা ফোঁটা কালিও খরচ করেননি। তবে লেখা সম্পূর্ণ হবার আগেই ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে জোনরাজের মৃত্যু হয়। গুরুর আরব্ধ কাজ শেষ করতে কাশ্মীরের ইতিহাস *তৃতীয় রাজতরঙ্গিনী* (*জৈন-রাজতরঙ্গিনী* নামেও পরিচিত) লিখতে বসেন শিষ্য শ্রীবর। ১৪৫৯ খ্রি.-১৪৮৬ খ্রি. সময়কলের কথা লিখলেও, শ্রীবর পণ্ডিতের লেখাতেও লাল্লা

অনুল্লিখিতই থাকেন। এরপর *রাজতরিঙ্গনী*-র অনুবর্তী কাশ্মীরের ইতিহাসকথা লেখা হয় *রাজপতাকাবলী* নামের বইতে। প্রজ্ঞাভট্টের এই বইটি অধুনালুপ্ত। জানা যায় বইটিতে তিনি ১৫১২/১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস লিখেছিলেন। প্রজ্ঞাভট্টের পরে তাঁর শিষ্য শুকের হাতে শেষ হয়, সংস্কৃত ভাষায় কাশ্মীরের রাজাদের ইতিহাস লেখার কাজ। *শুক-রাজতরঙ্গিনী*-তে ধরা আছে ১৫১৩ খ্রি.-১৫৮৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস। তবে সেখানেও লাল্লা কোথাও নেই।[২] সে সে-যুগের (চোদ্দ থেকে ষোল শতক) দরবারি সাহিত্যই হোক কিংবা ধর্মসম্পৃক্ত কোনও সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্যের কোনওখানেই লাল্লা নেই।[৩] শুধু সংস্কৃত সাহিত্য কেন দরবারি ফার্সি সাহিত্যের কোনও ইতিহাসবিবরণীতেও তিনি নেই। মির্জা হায়দার দৌলতের *তারিখ-ই রশিদী* (খ্রি. ১৫৪৬-৫১), অজানা কারোর লেখা *বাহারিস্তানী শাহী* (খ্রি. ১৬১৪), মালিক হায়দার তসোদুরের *তারিখী কাশ্মীরি* (খ্রি. ১৬১৭-১৮) কিংবা আঠারো শতকের ইতিহাসবিবরণী নারায়ণ কল আজিজের *মুন্তাখিব-উল তওয়ারিখ* (খ্রি. ১৭১০) ও রফি-উল-দীন গাহফিলের *নওয়াদিরি আখবার* (খ্রি. ১৭২৩)-এও লাল্লার নাম করা হয়নি।[৪]

দরবারি সাহিত্যের কোথাও লাল্লার নাম না-পাওয়া গেলেও কাশ্মীরের মানুষের মুখে মুখে আজ প্রায় ছ'শো বছর পার করেও লাল্লা সমানে জনপ্রিয়। কাশ্মীরের জনস্মৃতিতে লাল্লা আর তাঁর সুরে বাঁধা কবিতার স্মৃতি আজও অমলিন। কাশ্মীরিদের কাছে কখনও তিনি পরম স্নেহের ঘরের লাল্লা, কখনও পরমভক্তিমতী লালেশ্বরী, কখনও পরম শ্রদ্ধেয়া লাল্লা আরিফা, আবার কখনও পরম আদরের লাল দেদ (দেদ অর্থে দিদা, ঠাম্মা বা মা)। উচ্চবর্ণের হাতে লেখা সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা দরবারি ফার্সি সাহিত্য তাঁকে মনে না রাখলেও, কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ তাঁকে মনে রেখেছে। একপ্রজন্ম থেকে অন্যপ্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর কবিতা লোকের মুখে মুখে। অবশ্য মৌখিক ঐতিহ্যের বাইরে, সামান্য কয়েকটি লিখিত উপাদানে লাল্লার কথা লেখা আছে। সংস্কৃত নয় লাল্লার কথা জায়গা পেয়েছে ফার্সি সাহিত্যে। লাল্লার জীবনকালের প্রায় তিনশো বছর পরে লেখা যে বইটিতে প্রথম লাল্লার কথা পাওয়া যায়, সেটি ছিল বাবা দাউদ মিশকাতির লেখা *আসরার-উল-আবরার* (খ্রি. ১৬৫৪, সাধুসন্তদের গুপ্তরহস্য)। বইটি কোনও 'তারিখ' বা ইতিহাসের কালিক বিবরণীর বই ছিল না, ছিল 'তাজকিরাত' জাতীয় অর্থাৎ সুফিসন্তদের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত একটা বই। এই সুফি জীবনবৃত্তান্তটিতে মিশকাতি লাল্লাকে 'মজনুঁ-ই আকিলা' বা দিব্যোন্মাদিনী বলে উল্লেখ করেছিলেন। এরপর ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে খ্বাজা মুহাম্মদ আজ দেদমারী *ওয়াকিয়াৎ-ই কাশ্মীর* বা *তারিখ-ই আজমী* নামের বইতে কাশ্মীরের ইতিহাস লিখতে বসে লাল্লার কথা লিখেছিলেন। দেদমারী লিখেছিলেন যে, উচ্চতম স্তরের মরমিয়া সাধিকা ছিলেন লাল্লা আরিফা। আঠারো শতকে লেখা অপর একটি ইতিহাসবৃত্তান্তমূলক বই -আব্দুল ওয়াহাব শায়ইকের *তারিখী শায়ইক*-এ লাল্লার কথা লেখা হয়েছিল।[৫] এছাড়া আরও খানিকটা পরে উনিশ শতকে বীরবর কাচরু *মাজমুআ-আল-তওয়ারিখ* (খ্রি. ১৮৩৫-৩৬)-এ এবং পীর গুলাম হাসান *তারিখ-ই হাসান* (খ্রি. ১৮৩৫)-এ লাল্লার প্রশংসা করেছিলেন। গুলাম হাসান তাঁর লেখায় লাল্লাকে 'রাবিয়া-ই সানি' বা দ্বিতীয় রাবিয়ার আসনে বসিয়েছিলেন।[৬] এমনকি বিশ শতকের শুরুতেও ফার্সি সাহিত্য তাঁকে ভুলে যায়নি। হাজি মাহী-উল-দীন মিসকিন *তারিখী হাসান* (খ্রি. ১৯০৯-১০)-এ 'বিবি লাল্লা আরিফা'-র নাম করেছিলেন।[৭] অথচ এই দীর্ঘসময় জুড়ে সংস্কৃত সাহিত্যে লাল্লার নাম একটি বারের জন্যেও আসেনি। উচ্চবর্ণীয়

হিন্দুর ধর্মীয় কিংবা ধর্ম-বিযুক্ত সাহিত্যে তিনি প্রথম থেকেই ব্রাত্য।

হিন্দুদের লিখিত সাহিত্য লাল্লার সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকলেও কাশ্মীরি হিন্দুসমাজে লাল্লার কবিতা যে বিপুলভাবে জনপ্রিয় ছিল, সেকথা কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না। লাল্লার কবিতাগুলোর প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বইটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লাল্লা রচিত কবিতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন লিওনেল ডেভিড বার্নেট (খ্রি. ১৮৭১-১৯৬০) এবং বইটিতে শব্দতালিকা সংযোজন করেছিলেন স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন (খ্রি. ১৮৫১-১৯৪১)। ১৯১৪ সালে স্যার গ্রিয়ারসন ওঁর পূর্বতন সহকারী ও বন্ধু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মুকুন্দরাম শাস্ত্রীকে লাল্লার কবিতার একটা ভালো দেখে পুথি খুঁজে দিতে বলেন। অনেক চেষ্টা করেও মনমত একখানা ভালো পুথি কিছুতেই খুঁজে পাননি পণ্ডিতজি। শেষে ধর্মদাস দরবেশ নামের এক বুড়ো ব্রাহ্মণ কথকঠাকুরের দেখা পান পণ্ডিতজি। এই কথকঠাকুরটি কথা-গল্পের সঙ্গে সঙ্গে লাল্লার বলা কবিতাগুলোও গানের আকারে গেয়ে থাকতেন। কবিতাগুলো কথকঠাকুর শিখেছিলেন কুলপরম্পরাক্রমে। যার থেকে বোঝা যায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লাল্লার কবিতাগুলো কাশ্মীরের জনসমাজে ক্রমবাহিত হয়েছিল। ধর্মদাস দরবেশের মুখে শোনা কবিতাগুলো লিখে নিয়ে, তার সঙ্গে খানিকটা হিন্দিতে আর খানিকটা সংস্কৃতে, সেগুলোর একটা ভাষ্য তৈরি করে পণ্ডিতজি সাহেবকে দিয়েছিলেন।[৮] ওই কবিতাগুলোর অনুবাদই ১৯২০ সালে *লাল্লা-বাকানি, অর দ্য ওয়াইজ সেয়িংস অব লাল দেদ, আ মিস্টিক পয়েটেস অব অ্যানশিয়ান্ট কাশ্মীর* - নামে প্রকাশিত হয় এবং লাল্লার কথা সেই প্রথম ইংরেজি-ভাষী সারস্বত-জগতের সামনে আসে।

লাল্লার জন্মসাল নিয়ে মতান্তর থাকলেও জয়লাল কলের মতামতটিকেই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মেনে নেওয়া হয়। কলের মতে ১৩১৭-১৩২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লাল্লার জন্ম হয়েছিল এবং কখনওই ১৩২০-এর পরে অন্তত নয়।[৯] লাল্লার জীবনের কথা সত্যিই বিশেষ একটা জানা যায় না। ওই কয়েকটা ফার্সি সাহিত্য আর তাঁর কবিতাগুলোই যা সম্বল। তবে সেসব থেকে দেখা যায় যে লাল্লা জন্মেছিলেন কাশ্মীরের পানন্দ্রেনথানের সচ্ছল এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। সে যুগের রীতি মেনে বাল্যাবস্থায় মাত্র বারো বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়, পদ্মপুর বা অধুনা পাম্পোরের কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারের ছেলে নিক ভট্টের সঙ্গে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে তাঁর নতুন নাম হয় পদ্মাবতী। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে সৎ শাশুড়ির কটুবাক্য, অমানবিক ব্যবহার লাল্লাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। স্বামীর প্রতি অনাসক্তির কারণে লাল্লার কপালে চারিত্রিক দোষের অপবাদ জুটতেও দেরি হয় না। দিনকে দিন স্বামী ও শাশুড়ির অত্যাচারের মাত্রা বাড়তেই থাকে। অথচ এত নিপীড়নের পরেও সমস্তটাই তিনি মুখ বুজে সহ্য করতেন এবং একটি অভিযোগ পর্যন্ত কখনও করতেন না। এই নিদারুণ সাংসারিক কষ্টের মধ্যে থেকেই তিনি কঠোর আত্ম-নিয়ন্ত্রণে নিজ মনকে নিয়োজিত করেন এবং সমস্ত জাগতিক বিষয়ে উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকার অভ্যাস রপ্ত করেন। প্রতিদিন তাঁর শাশুড়ি থালায় একটা বড় পাথর ভাত দিয়ে ঢেকে লাল্লাকে খেতে দিতেন, যাতে কেউ দেখলে ভাবে লাল্লা কত খায়! এরইমধ্যে একদিন তাঁদের বাড়িতে গ্রহশান্তি পুজো, অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জবাই করা হয়েছে ভেড়া আর লাল্লা গিয়েছে রোজকার মতো নদীতে জল আনতে। পথে দেখা হয় এক পড়শির সঙ্গে, পড়শিটি মজা করে বলেছে, আজ সন্ধেয় জোর খাওয়া-দাওয়া জুটবে লাল্লার, আজ তো তোদের বাড়িতে বিরাট ভোজ, সেই শুনে লাল্লাও তার উত্তরে

বলেছে,

"হুন্দ মারিতান কিনহ কটহ নোশি নলভট নাহ জাহ"[১০]

ভেড়া সে ছোট বা বড় যেমনই জবাই হোক, ছেলের বউয়ের পাতে ঠিক পাথরই জুটবে। লাল্লার এ উত্তর কালে কালে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। লাল্লার সেদিনের উত্তরখানা শুধু পড়শিটিই শোনেনি, আড়াল থেকে লাল্লার শ্বশুরমশাইও শুনেছিলেন এবং পরখ করতে গিয়ে দেখেছিলেন, লাল্লা মিথ্যে বলেনি। সত্যিটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় লাল্লার শাশুড়ির রাগ যায় আরও বেড়ে এবং লাল্লার ওপর অত্যাচারের মাত্রা পৌঁছয় চরমে। এভাবে অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়ালে হঠাৎই একদিন লাল্লা চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগের পর সঙ্গবিমুখ লাল্লা কাশ্মীরের পাহাড়-পর্বতের অন্দরে-কন্দরে, অরণ্য-জঙ্গলে তাঁর একাকী জীবন কাটাতে থাকেন। এ সময় লাল্লার পেট অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে পড়েছিল। কাশ্মীরিতে 'লালা' বা 'লোল' কথার মানে পেট। এই ঝুলে পড়া পেটের জন্যই, বিশেষ এই দৈহিক বৈশিষ্ট্যটির কারণেই লোকে তাকে 'লাল' বলে ডাকত।[১১] কখনও বা 'লাল মাতস', মানে লাল পাগলী।[১২] এরমধ্যে কোনও একসময়ে ঘরছাড়া লাল্লার দীক্ষা হয় তাঁর শ্বশুরবাড়ির কুল-পুরোহিত কাশ্মীরি শৈব সাধক সিদ্ধ শ্রীকণ্ঠ বা সিদ্ধা মোলের হাতে শ্রীকণ্ঠ ছিলেন কাশ্মীরি ত্রিক শৈবদর্শনের সর্বজনমান্য শাস্ত্রকার *শিবসূত্র*-এর রচয়িতা বসুগুপ্তের উত্তরপুরুষ। কাশ্মীরি শৈবদের দীক্ষাদানের প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ সহজ-সরল গোছের। উপদেশ বা মার্গনির্দেশ করাই শৈব প্রক্রিয়াতে দীক্ষা। কাশ্মীরি শৈবরা বিশ্বাস করেন যে মোক্ষের জন্য দীক্ষা অপরিহার্য নয়, বরং জ্ঞান ও মোক্ষের জন্য যার তীব্র আগ্রহ জন্মেছে, তেমন যে কেউ, শৈবদর্শন অধ্যয়ন ও অভ্যাস করতে পারেন, শৈবদর্শনের তত্ত্ব ও ক্রিয়াকলাপ সকলেই গ্রহণ করতে পারেন। কাশ্মীরি শৈবরা এক্ষেত্রে জাতপাতভেদের সম্পূর্ণ উর্দ্ধে ছিলেন।[১৩] ফলে ধরা যেতে পারে মেয়ে হয়েও, গৃহত্যাগী হবার পরেও শৈবধারায় দীক্ষা পেতে লাল্লাকে হয়তো সমস্যা পোহাতে হয়নি।

লাল্লার জন্মের মতো মৃত্যুর ক্ষেত্রেও জয়লাল কলের মতটিই স্বীকৃতি পেয়েছে। কলের মতে ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সম্ভবত লাল্লার মৃত্যু ঘটে।[১৪] লাল্লার কোনও সমাধি-মন্দির জাতীয় কিছু না থাকায়, তিনি যে ঠিক কোথায় মারা গিয়েছিলেন, সে-কথা স্পষ্ট করে বলা যায় না।[১৫] তবে জনশ্রুতির ভিত্তিতে অনেকে বলে থাকেন, ১৩৭৬ খ্রিস্টাব্দে বিজবেহরাতে লাল্লার মৃত্যু হয়।[১৬] আবার এমন জনশ্রুতিও আছে যে বিজবেহরার জামী মসজিদের ঠিক বাইরে তিনি মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পর দেহ-সৎকার নিয়ে তাঁর হিন্দু ও মুসলমান অনুরাগীদের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। হিন্দুরা দাবি করে যে লাল্লার দেহ দাহ করা হোক আর মুসলমানেরা বলে লাল্লার দেহ কবর দেওয়া হোক। শেষ দুইদলই যখন নিজমতে সৎকারের জন্য আসে, দেখে লাল্লার দেহের বদলে সেখানে পড়ে আছে ফুলের এক স্তূপ। এক দল অর্ধেকটা ফুল নিয়ে গিয়ে দাহ করে আরেক দল অর্ধেকটা কবর দেয়। বিজবেহরার জামী মসজিদের বাইরে পুরোনো একটা কবর দেখিয়ে আজও নাকি অনেক কাশ্মীরি বলে, সেটা তাদের লাল্লা আরিফার সমাধিস্থান।[১৭]

পরবর্তীকালের অপর দুই ভক্তিবাদী সাধক, কবীর[১৮] ও দাদূ[১৯], যাঁরা হিন্দু-মুসলমান— দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাঁদের মৃত্যু সম্পর্কেও এই একই আখ্যানের অনুবৃত্তি কিন্তু ভক্তমুখে

শোনা যায়। এখনকার আখ্যান-বৃত্তান্তটি কাকে প্রভাবিত করেছে — আজ সেকথা বলা কঠিন। তবে এই আখ্যান-কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল সাধিকা বা সাধকের অলৌকিক শক্তির ওপর অধিকার। ধর্মের পরিসরে সাধক বা সাধিকার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হবার বিষয়টি তাঁর মহত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অলৌকিক ক্ষমতার ব্যতিক্রমী অধিকার বিশ্বাসী ও অর্ধ-বিশ্বাসী অনুরাগীকুলের কাছে সাধক ও সাধিকার মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। যার ফলে সমাজে তাঁদের মান্যতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হবার বিষয়টা সাধক-সাধিকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একটা উৎস হয়ে দাঁড়ায়। দৈব-ক্ষমতা প্রকাশের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ভক্তমনে এবং সমাজের ওপর সাধক-সাধিকার 'ক্যারিশ্ম্যাটিক অথরিটি' তৈরি করে।[২০] যার জন্য বহু ক্ষেত্রেই সাধক-সাধিকার জীবনকে ঘিরে থাকে অলৌকিক সব ঘটনার আখ্যান, বৃত্তান্ত। আমাদের লাল দেদও এর বাইরে নন। ১৯২১ সালে লাল দেদের কথা আলোচনা করার সময় আনন্দ কল এমন অনেকগুলি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সময়ের কোলে কোন বৃত্তান্তটি যে কখন তৈরি হয়েছে —তার রহস্য উদ্ঘাটন করা আজ দুঃসাধ্যই বটে। তবে অলৌকিক ঘটনারাজি যে লাল দেদের জনপ্রিয়তার গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ — তা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না, অথবা তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন বলেই হয়তো তাঁর সম্পর্কে অলৌকিক সব আখ্যান কাশ্মীরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে। অলৌকিক না হোক আনন্দ কলের বলা একটা সাধারণ গল্পই না-হয় শোনা যাক; লাল্লা যেখানেই যেতেন দেখা যেত যে, কিছু বাচ্চা-কাচ্চা সেখানে ঠিক জুটে গেছে, আর তারা চলতও লাল্লার পিছন পিছন, তাঁকে ক্ষ্যাপাতে ক্ষ্যাপাতে। লাল্লাও চলতেন নির্বিকার মুখেই। একদিন এক জামা-কাপড়ের দোকানের সামনে দিয়ে লাল্লা যাচ্ছেন আর বাচ্চা-কাচ্চা তাঁর পিছন পিছন আসছে হৈ হৈ করতে করতে। তাই না দেখে দোকানির হয়েছে খুব রাগ। সে গিয়ে বকাঝকা করে বাচ্চাদের দিয়েছে হটিয়ে। এদিকে দোকানির পিছু পিছু লাল্লাও এসে ঢুকেছেন দোকানঘরে। দোকানঘরে ঢুকে লাল্লা দোকানির কাছে চেয়েছেন বড় একখানা কাপড়। দোকানি তখন খুশিমনেই অমন একটা কাপড় দিয়েছে লাল্লাকে। কাপড় দিলে, লাল্লা দোকানিকে বলেন, ঠিক সমান দু'টুকরো কাপড়খানা কেটে দিতে, যাতে দুটো ভাগের ওজনই একেবারে সমান থাকে। সমান ভাগে, সমান ওজনে কাটানো কাপড়ের টুকরো দুটো দু'কাঁধে ফেলে দোকান থেকে লাল্লা যান বেরিয়ে। যেতে যেতে পথে তাঁর দেখা হয় এক পথিকের সঙ্গে, পথিকটি তাঁকে সম্মান জানায়, সঙ্গে সঙ্গে লাল্লা তাঁর বাঁ কাঁধের টুকরোয় একটা গিঁট বাঁধেন। তারপর আবার তিনি চলতে থাকেন, এবার চলতে চলতে তাঁর দেখা হয় আরেক পথিকের সঙ্গে, এই পথিকটি লাল্লার সঙ্গে ভীষণ দুর্ব্যবহার করে। আর অমনি লাল্লা গিঁট ফেলেন তাঁর ডান কাঁধের টুকরোয়। এমনিভাবে হাঁটতে হাঁটতে, পথে কত লোকের সাথে দেখা হয় তাঁর, আর তিনি গিঁট বাঁধতে থাকেন হয় বাঁ কাপড়ে নয় ডান কাপড়ে। দিনের শেষে লাল্লা ফিরে আসেন দোকানঘরে। দোকানিকে বলেন কাপড়ের টুকরো দুটো ওজন করতে, গিঁটগুলোতে কোন টুকরোয় কতটা ওজন বাড়াল একবার দেখে নিতে। দোকানিও ওজন করে দেখল স্বাভাবিকভাবেই টুকরো দুটোয় কাপড়ের ওজন, গিঁট বাঁধার আগে যা ছিল, এখনও তাইই আছে। লাল্লা তখন দোকানিকে বললেন, বাচ্চারা বিরক্ত করে বলে রাগ করার কিচ্ছুটি নেই, মান-অপমান দুইয়েই তাঁর কিছু যায়-আসে না, এত গিঁটের পরেও কাপড়ের কি কিছু এল-গেল, ওজন কি তার পাল্টাল।[২২] গল্পটা সত্যিই হোক কিংবা মিথ্যা, লাল্লা কিন্তু এমন সহজ-সরলভাবেই কথা বলতেন।

গূঢ় দার্শনিকতত্ত্ব সহজে সাধারণ মানুষের বোঝার মতো করে যে-কাউকে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। তার প্রমাণ লাল্লার কবিতা, লাল্লা বাখ বা লাল্লা বাখী, বাংলায় বলা যায় লাল্লার বচন। ছ'শো বছরেরো বেশি সময় ধরে লাল্লার বেঁচে থাকার এটাই কারণ— তাঁর কবিতা— লাল্লা বাখ।

লাল্লার বাখগুলো হতো ছোটো; মনে রাখা খুব সহজ, যথাযথ এবং সহজবোধ্য, শুনতে সুমিষ্ট আবার কখনও রোমহর্ষকও, আবার লাল্লার এক একখানা বাখ কখনও হতো প্রাণ-প্রদায়ী কথার সমান।[২৩] ফলে লাল্লার বাখে সহজেই সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হতো। লাল্লা তাঁর বাখগুলোকে গেঁথেছিলেন ছন্দে, ছন্দোবদ্ধ বাখগুলোতে সেজন্য অনায়াসেই ধরা পড়ত সুর ও লয়ের চলন। লাল্লাই কাশ্মীরি ভাষার প্রথম কবি, লাল্লার আগে কেউই সম্পূর্ণভাবে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় কোনও সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, এ ব্যাপারে লাল্লাই প্রথম।[২৪] গৃহত্যাগী লাল্লা যখন বাখ রচনা করছেন ততদিনে, তখন তিনি শৈব সাধিকা। সাধনার সেই নিবিড় মরমিয়া অনুভূতি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে ছন্দে বদ্ধ করে 'বাখ'-এ রূপ দিয়েছিলেন লাল্লা। প্রায়শই লাল্লার বাখগুলো মাত্র চার পংক্তির হতো। মরমিয়া জ্ঞানে সমৃদ্ধ বাখগুলো যেমন নীতিপূর্ণ উপদেশাত্মক হতো তেমনি অনেকসময় বাখগুলোতে থাকত তাঁর সাধন-অভ্যাসের নানা কথা। তাঁর বাখগুলো থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি শৈব ত্রিক পরম্পরার একজন সাধিকা ছিলেন। যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে কী কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে, শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন যাপন করে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন -সেকথা তাঁর বাখে জায়গা করে নিয়েছিল। ফলে তাঁর সাংসারিক জীবন সম্পর্কে মৌখিক ঐতিহ্য থেকে স্পষ্টভাবে কিছু জানা না গেলেও, তাঁর বাখগুলো থেকে বেশ ভালোভাবেই তাঁর অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়।[২৫] সেখানে লাল্লার নানা রূপ, কখনো তিনি নম্র, বিনয়ী; কখনও শুধুই আত্মদর্শী, অন্তর্মুখী এক যোগিনী; কখনও কেবলই ঘরহীন পরিব্রাজিকা, সদাভ্রমণরত এক সাধিকা।[২৬] আবার লাল্লার বাখ প্রমাণ করে সাধিকা হবার পাশাপাশি তিনি তীব্র অনুভূতিসম্পন্না এবং গভীরভাবে চিন্তাশীল, অনুধ্যায়ী একজন নারীও ছিলেন বটে।[২৭] দৃশ্যকল্পতুল্য রূপকের ব্যবহারে লাল্লা ছিলেন চূড়ান্ত দক্ষ। রোজকার জীবনের চেনাজানা পরিবেশ থেকে নানা উদাহরণ টেনে এনে, তাকে আশ্চর্য রূপকে ও রূপকল্পে সাজিয়ে তিনি তৈরি করতেন বাখ।[২৮]

লাল্লা-বাখ ছিল কাশ্মীরি অদ্বৈতবাদী শৈব ত্রিকদর্শনের আধারে আশ্রিত। কিন্তু তা বলে লাল্লার বাখে দর্শনতত্ত্বের জটিলতা বিন্দুমাত্র থাকত না। ত্রিক শৈবাগমের অন্তর্নিহিত দর্শনের সারকথা লাল্লা তাঁর সহজ-সরল বচনের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।[২৯] বাখগুলোতে ধরা পড়ত নিজ-বিশ্বাসের প্রতি লাল্লার আন্তরিকতা, একইসঙ্গে বাখগুলিকে ছুঁয়ে থাকত মরমিয়া অনুভূতির অতলস্পর্শী গভীরতা। যার কাব্যিক প্রকাশ হতো অকৃত্রিম এবং মানুষ সহজে অনুভব করতে পারত লাল্লার বচনের অন্তর্নিহিত স্বতঃস্ফূর্ত তেজকে। তাঁর বচনে মানুষ খুঁজে পেত এক আত্মপ্রত্যয়ীর প্রগাঢ় বোধশক্তির পরিচয় যা অনায়াসে ব্যক্ত করতে পারত মরমিয়া সত্যকে।[৩০]

ত্রিকদর্শন বৈদান্তিকদের মতো জগতকে মায়া বলে স্বীকার করে না। ত্রিক শৈবদের কাছে জগৎ সত্য। তাই লাল্লার কাছেও লাল্লার জগৎ সত্য, আর সেই জগতে কখনও তিনি পরম করুণাময়ী, মানবিক, কখনও

বা চরম বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহিনী। শৈব লাল্লার কাছে ধর্মীয় আচারবিধি পালন করার বিষয়টাই ছিল গুরুত্বহীন। মূর্তিপূজার প্রতি ছিল তাঁর তীব্র অনাস্থা। তীর্থযাত্রা, মূর্তিপূজা— এসবই ছিল তাঁর কাছে মূল্যহীন। পশুবলির তীব্র বিরোধী তিনি। সহনশীলতা আর সহানুভূতির জোরালো বার্তা তাই তাঁর বাখে, যেখানে প্রাণহীন পাথরের কাছে জ্যান্ত ভেড়া চড়ানো নিতান্তই অমূল্য বলে মনে হয় তাঁর।[৩১] বাখগুলোর ভিতর দিয়ে লাল্লা মানুষকে শেখাতেন কীভাবে শিখতে হবে সৌম্য-ব্যবহার; কীভাবে কামাতুর, লোভী, অহংকারী জীবনের উর্দ্ধে গিয়ে একজন সহজ-সরল মানুষ হয়ে উঠতে হবে। সেকারণেই অহংকারী পণ্ডিতরা তাঁর নিশানার বাইরে ছিলেন না। লাল্লা পণ্ডিতদের আক্রমণ করেছিলেন, বিশেষত যাঁরা জ্ঞানের অহংকার করতেন তাঁদের। বাখের মাধ্যমেই জ্ঞানবর্গীদের দিকে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, পণ্ডিতদের জ্ঞানে প্রকৃত প্রজ্ঞা কোথায়?[৩২] লোভ, অহংকার ত্যাগ করে, মান-অপমানবোধ এক করে খুঁজলে তবেই তো জিজ্ঞাসু শিবকে খুঁজে পাবেন। কিন্তু, ''শিব ছুইয় করুত'হ'', শিবকে খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন।[৩৩] লাল্লার দর্শনে শিব চৈতন্যস্বরূপ।

লাল্লা একদিকে যেমন পরম করুণাময়ী, অন্যদিকে তিনিই চরম বিদ্রোহিনী। দেখা যায় যে পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু-সমাজের বহু নিষেধবিধি উল্লঙ্ঘন করে, তবেই তিনি অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করেছেন। পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাল্লার প্রথম বিদ্রোহ— তাঁর গৃহত্যাগ। গৃহত্যাগ করার মানে শুধু বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই তো নয়, একইসঙ্গে পরিবার ত্যাগ করে চলে যাওয়াও। কিন্তু পরিবার-ত্যাগী মেয়ে কী হিন্দু-সমাজে গ্রহণযোগ্য? কুলবধূ পরিবার ছেড়ে চলে গেলে তাঁকে কী 'আদর্শ রমণী' বলা যায়? হিন্দু-সমাজের নিরিখে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, রক্তের শুদ্ধতা রক্ষায় বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রকারদের কাছে পরিবার রক্ষার পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, এবং পরিবারের পবিত্রতা রক্ষার দায় অনেকটাই গিয়ে পড়েছিল মেয়েদের ওপর, বিশেষত বিবাহিতা স্ত্রী-এর ওপর। যেকারণে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষতন্ত্রও নারীর যৌনতাকে পুরুষের বশবর্তী করতে চেয়ে, তাকে নতুন করে সংগঠিত ও শৃঙ্খলিত করতে এগিয়েছিল। পরিবার ও সমাজ রক্ষার খাতিরে পুরুষতন্ত্রের প্রধান একটা উদ্দেশ্যই ছিল নারীর যৌনতাকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে রাখা।[৩৪] 'স্ত্রীধর্ম'-এর আদর্শ তৈরি করে মেয়েদেরকে পুরুষের অনুগত করতে চেয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ শাস্ত্রকাররা। নারীর স্বভাবকে সেজন্য তারা 'স্ত্রীস্বভাব'-এর ধারণাভুক্ত করেছিল এবং সেই স্বভাব শাস্ত্রকারদের চোখে ছিল ভয়ঙ্কর। কেমন ছিল শাস্ত্রকারবর্ণিত সেই 'স্ত্রীস্বভাব'? মনু-সংহিতার নবম-অধ্যায়ের ১৬-১৮তম শ্লোকে বলা হচ্ছে,

''বিধাতা কর্তৃক স্ত্রীদিগের এইরূপ স্বভাব সৃষ্ট, পুরুষ ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়া, তাহাদিগের রক্ষণের প্রতি অতিশয় যত্নবান থাকিবে। শয়ন, উপবেশন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, কৌটিল্য, পরহিংসা, ঘৃণিত ব্যবহার, এই সকল স্ত্রীলোকের স্বভাবগত, ইহা সৃষ্টিসময়ে মনু স্বয়ং কল্পিত করিয়াছেন। যেহেতু স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্র দ্বারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হয় না, এজন্য উহাদের নির্মল অন্তঃকরণ হয় না, এবং বেদস্মৃতিতে অধিকার নাই, এজন্য উহারা ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না, এবং ইহাদিগের কোন মন্ত্রে অধিকার নাই, এজন্য পাপ হইলে মন্ত্র দ্বারা তাহা ক্ষালন করিতে পারে না; অতএব ইহারা কেবল মিথ্যা পদার্থ।[৩৫]

এই হল মনুমতে 'স্ত্রীস্বভাব', এর বিপরীতে 'স্ত্রীধর্ম'-এর বৈশিষ্ট্য ঠিক কেমন? মনু-সংহিতার একই অধ্যায়ের ২৮ ও ২৯তম শ্লোক দেখা যাক,

‘‘অপত্যের উৎপাদন অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ এবং আত্মশুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং পিতৃগণের ও আত্মার সন্তান দ্বারা স্বর্গলাভ, এ সকল কার্য্য পত্নী দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে পতির কোন অনিষ্ট চিন্তা করে না, ঐ স্ত্রী ভর্ত্তার পুণ্যে অর্জিত যে স্বর্গলোক, তাহাতে তাহার সহিত বাস করে, ইহলোকে সাধ্বীরূপে যশোলাভ করে।’’[৩৬]

উমা চক্রবর্তীর মতে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রকারদের চোখে ‘স্ত্রীস্বভাব’ অর্থাৎ লাগামহীন যৌন-চাহিদাই মেয়েদের মূল প্রকৃতি আর তার বিপরীতে স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত পতিব্রতা স্ত্রী-ই, ‘স্ত্রীধর্ম’-অনুসারে আদর্শ রমণী এবং নারীর ‘স্ত্রীস্বভাব’ প্রতিমুহূর্তে ‘স্ত্রীধর্ম’ থেকে তাকে বিচ্যুত করতে চায়, ফলে পাতিব্রত্য-ই পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রকারদের কাছে হিন্দু স্ত্রী-র পালনীয় প্রধান ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য হয়ে ওঠে। পাতিব্রত্য-ই হয় নারীর ব্যক্তিস্বরূপের চরমতম প্রকাশ।[৩৭]

ঘর এবং পরিবার বা কুল ছেড়ে লাল্লা প্রথমেই এই ‘স্ত্রীধর্ম’-এর আদর্শকে আঘাত করেছিলেন। যারা এই আদর্শের কাঠামোয় পড়বেন না তারাই পুরুষ শাস্ত্রকার নির্ধারিত সমাজ-ব্যবস্থায় ‘বিচ্যুত’ এবং ‘বিপজ্জনক’ বলে চিহ্নিত হয়ে যাবেন। বিধবা, গণিকা ও সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে একটি মিল হচ্ছে যে তাঁদের কোনও স্বামী বা পুরুষ হর্তা-কর্তা নেই। তাই বিধবা ও গণিকাদের মতই হিন্দুসমাজে সন্ন্যাসিনীরাও সামাজিকভাবে ‘অপর’ বলে চিহ্নিত হন।[৩৮] অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করেও শৈব সাধিকা লাল্লা তাই হিন্দু শাস্ত্র-সমাজের কাছে ‘অপর’-ই থেকে যান। আসলে পিতৃতান্ত্রিক-কাঠামোর ভিতরে অধ্যাত্মচর্চাও মেয়েদের কাছে দড়ির ওপর হাঁটার সামিল।[৩৯]

ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রকারদের দেখান পথে লাল্লা চলেননি, বাখের মধ্য দিয়ে প্রচলিত লিঙ্গের ধারণাকে তিনি তাই আঘাত করতে পেরেছেন।[৪০] শুধুই কী বাখ? লাল্লা তাঁর বাখ দিয়ে, তাঁর শরীর দিয়ে পিতৃতন্ত্রকে আঘাত করে গেছেন। বাখের থেকেই শরীর দিয়ে যখন তিনি পিতৃতন্ত্রকে আঘাত করেছেন, তখন সে আঘাতের রূপ পৌঁছেছে চরম পর্যায়ে। আরাধ্য শিবের মতই ভক্ত লাল্লা অ-কুল, তাঁর পরমপ্রিয় দিগম্বরের মতই তিনি বসনত্যাগী, লাল্লা দিগম্বরী; তখন দিক (দশদিক)-ই তাঁর অম্বর (পোশাক)। শোনা যায় লাল্লাকে সবসময় দিগম্বরী বা অর্ধ-দিগম্বরী অবস্থাতেই দেখা যেত। একবার পাম্পোরের এক মাঠে বসেছে যাত্রার আসর, লোকে-লোকারণ্য। লাল্লাও গেছে সেখানে, তবে দিগম্বরী বেশে। মাঠে হঠাৎ দেখা শ্বশুরের সঙ্গে, তাকে দেখে শ্বশুরমশাই ঘরে ফিরে আসতে বলে, বকাঝকাও করে অমন বেশ দেখে। তাতে তো লাল্লা হেসেই কুটোপাটি, খানিকটা ব্যঙ্গ করেই বলেন, সেখানে কী কোনও মানুষ আছে, যে তাকে পোশাক পরতে হবে? তারপর শ্বশুরমশাইকে তিনি চারপাশে চাইতে বলেন। শ্বশুরমশাই চেয়ে দেখেন সে মাঠে একটি জনমনিষ্যি কোথাও নেই, চারদিকে শুধু ভেড়া-ছাগল, হাঁস-মুরগী সব চরে বেড়াচ্ছে।[৪১] এই আখ্যান একদিকে যেমন ত্রিকদর্শনের জীবমাত্রেই পাশ-বদ্ধ পশু, মতটিকে মনে করিয়ে দেয় তেমন অন্যদিকে, এই অলৌকিক-আখ্যান কী আসলে লাল্লার প্রতি সহৃদয় পুরুষতন্ত্রেরই এক নম্র বয়ান নয়। এই আখ্যান দেখায় মেয়েদের স্বাধিকারকামী আধ্যাত্মিকতা শেষবিচারে সেই পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধকেই আঘাত করে। এবং পুরুষতন্ত্রকে আঘাত করার শক্তি আছে বলেই আধ্যাত্মিকতাও মেয়েদের কাছে ‘এম্পাওয়ারমেন্ট’ বা ক্ষমতায়নের একটা উপায় হয়ে ওঠে, আর সেই আধ্যাত্মিকজগতে মেয়েরাও পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, এমনকি

দুমড়ে-মুচড়ে তাকে 'সাবভার্ট'-ও করতে পারে।[৪২] লাল্লা ওঁর বাখে শ্বশুরবাড়ির পদ্মাবতী নামটা কখনও ব্যবহার করেননি। এই প্রত্যাখ্যান শেষপর্যন্ত তো সেই পিতৃতন্ত্রকেই আঘাত করে। আর ভ্রুক্ষেপহীনভাবে জনসমক্ষে দিগম্বরী হয়ে হাঁটাকে, একাকী বিদ্রোহিনীর হাতে, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত 'সাবভার্সান' ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়।

পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আঘাত করার প্রশ্নে আবার ফিরে আসা যাক লাল্লা বাখীর কথায়। বাখের বিষয়বস্তু তো প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে আঘাত করছেই, সে তো আমরা আগেই দেখেছি, কিন্তু বাখের প্রকাশভঙ্গিকেও কী দেখা যায় না পিতৃতন্ত্রের ওপর আঘাত হিসেবে? ১৯৭৬ সালের এডিনবার্গ ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যায় ফরাসী নারীবাদী-তাত্ত্বিক জুলিয়া ক্রিস্তেভা এক প্রবন্ধ লেখেন, 'সিগনিফাইং প্র্যাক্টিস অ্যান্ড মোড অব প্রোডাকশান' নামে, সেখানে তিনি পিতৃতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে মিস্টিকদের ক্ষেত্রে 'ম্যাডনেস, হোলিনেস, পোয়েট্রি'-র মধ্যে একটা আন্তসম্পর্কের কথা আলোচনা করেন। ক্রিস্তেভা দেখান যে মিস্টিকরা অচেতনে ডুবে থাকা 'ডিসায়ার'-এর পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে 'সিম্বলিক' বা বলা ভালো পিতৃতান্ত্রিক ভাষা-কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং প্রি-অডিপাল, সেমিওটিক ভাষার দিকে মুখ ফেরান।[৪৩] লাল্লার ক্ষেত্রে এই কথাগুলোকে কিন্তু কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ আমাদের লাল্লা মিস্টিক, লাল্লা দিব্যোন্মাদিনী, লাল্লা যোগিনী-সাধিকা, লাল্লা কবি। লাল্লার স-হ-জ বাখ পিতৃপুরুষের শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতে নয়, প্রকাশিত হয়েছে কবিতার আকারে সহজবোধ্য কাশ্মীরিতে, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়। কবিতার ছন্দময় রূপ গদ্যভাষার যুক্তি-নির্ভর কাঠামোকে অস্বীকার করতে পারে, যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাকরণের বেঁধে দেওয়া নিয়মকে অতিক্রমও করতে পারে। ফলে লাল্লাও কাব্য-ভাষার ছন্দময়তা দিয়েই তার প্রকাশভঙ্গির ওপর নির্ভর করেই হয়তো পুরুষের বেঁধে দেওয়া 'যুক্তিগ্রাহ্য' সমাজবিধিকে পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

লাল্লা একা, অধ্যাত্মজগতে তাঁর দ্রোহও, এক ব্যক্তিমানুষের একক বিদ্রোহ। লাল্লা কোনও ভক্তকুল রেখে যাননি, কোনও সম্প্রদায় বা কাল্টও তৈরি হয়নি লাল্লাকে ঘিরে। তবে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী ছিলেন নন্দ ঋষি, শেখ নূর-উদ-দীন নূরানী (খ্রি ১৩৭৭-১৪৩৮), কাশ্মীরের ঋষি সুফি সিলসিলার প্রবর্তক। নূর-উদ-দীন লাল্লাকে মায়ের আসনে বসিয়েছিলেন। লাল্লা সঙ্গবিমুখ হলেও সৎসঙ্গে অনাগ্রহী ছিলেন না। তিনি অনায়াসে সাধুসঙ্গ করতেন, অনায়াসে সুফিসঙ্গ করতেন। ধর্মের পার্থক্য লাল্লার জীবনে বিন্দুমাত্র কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। ধর্মের ব্যাপারে লাল্লার এমন দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকে 'সেকুলার' বলতে চান।[৪৪] তবে লাল্লার দৃষ্টিভঙ্গিকে 'সেকুলার' বলা 'আন্যাক্রোনিজম' বা কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট হবার সামিল। লাল্লা শুধু সাধনা করেননি তিনি অদ্বৈতবাদী শৈব ত্রিকদর্শন আত্মস্থ করেছিলেন। কাশ্মীরি শৈবরা অদ্বৈতবাদী, ভেদ ও অভেদকে তাঁরা 'একে'রই দুই রূপ বলে চেনেন। তাঁরা মানেন শিব অর্থাৎ চৈতন্য থেকেই জগতের উৎপত্তি এবং যেহেতু পরমশিব স্বেচ্ছায় নিজেকে জগৎরূপে অভিব্যক্ত করেছেন, তাই এই জগৎ শিবের মতোই সত্যি— তার অস্তিত্ব আছে, জগৎ মিথ্যা নয়। শিবই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয়ে, তাঁর বিশ্বাত্মক রূপের প্রকাশ ঘটিয়ে এক থেকে বহু হয়েছেন আবার বিশ্বোত্তীর্ণ রূপে তিনিই নিজের প্রকৃত স্বরূপ থেকে সদা অবিচ্যুত এবং সৃষ্টির উর্দ্ধে বিদ্যমান।[৪৫] শিবই স্বেচ্ছায় বহু হয়েছেন আবার বহুর মূলে সেই তিনিই— এক। অ-দ্বৈতের

এই সমন্বয়ী ভাবনাই লাল্লা জীবন দিয়ে সাধন করেছেন, সেই দর্শনবোধই তাঁকে আত্মপর ভেদের বহু উর্দ্ধে নিয়ে যেতে পেরেছে। সেজন্যেই লাল্লা হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদ দেখেননি,

"ফসলের প্রতিটি দানাই শিবের থান
বলে কেনো খামোকা হিন্দু-মুসলমান?
জ্ঞানী যদি হও, নিজেকে চেনো তবে,
তবেই না তোমার শিবকে জানা হবে।"[৪৬]

কাশ্মীরের হিন্দু-মুসলমানও লাল্লাকে দূরে ঠেলে দেয়নি, সেখানে সুফিয়ানা গানের আসর 'মজলিস-এ-মারেফিন' শুরুই হয় লাল্লা-বাখী গেয়ে।[৪৭] লাল্লার মরমিয়া মন চিত্তভূমির নানা অবস্থায় ভ্রমণ করে তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। চৈতন্যের সম্যক অনুভূতি, মরমিয়ার অন্তর্দৃষ্টি তাকে রূপ থেকে অরূপকে, সাকার থেকে নিরাকারকে চিনতে শিখিয়েছিল। সেজন্যেই হবে জীবনে মান বা অপমান দুই-ই তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। অনাসক্তির সাধনায় সিদ্ধ লাল্লা অনায়াসে তাই বলতে পেরেছিল,

"জীবনও যা মরণও তাই, আমার কাছে
আমি বাঁচতে সুখী, আমি মরতে সুখী
কারো জন্য বিষাদ গাইনি আমি,
আমার জন্য বিষাদ গায়নি কেউ।[৪৮]

সূত্রনির্দেশ :

১। Kaul, Jayalal. 1973. *Lal Ded.* New Delhi: Sahitya Akademi., P. 2.

২। *Ibid.*, P. 3.

৩। Raina,Trilokinath. 2002. *A History of Kashmiri Literature.* New Delhi: Sahitya Akademi., p. 17.

৪। Kaul. 1973., op cit., pp. 3, 135.

৫। *Ibid.*, P. 4.

৬। *Ibid.*, P. 4 .
খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে আরবের বসরা শহরে সুফি সাধিকা রাবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। কবিতা ও ঈশ্বরপ্রেমের জন্য সুফি সমাজে তিনি পরম শ্রদ্ধেয়া রূপে বিবেচিত হন।

৭। Kaul. 1973., *op cit., p. 5.*
সুফি-শাস্ত্র মরমিয়া জ্ঞানকে ইরফান বলে। ইরফানের অধিকারী আরিফ এবং অধিকারিনী আরিফা।

৮। Gierson, Sir George., & Barnett, Lionel D. 1920. *Lalla-Vakyani, or The Wise Sayings of Lal Ded Mystic Poetess of Ancient Kashmir.* London: Royal Asiatic Society., p. 4.

৯। Kaul. 1973., *op cit., p. 7.*

১০। Koul, Anand. 2021. *Lalla Vakyani And Life Sketch of Lalla Yogeshwari.,* https://archieve.org/details/stJv_lalla-vakyani-and-life-sketch-of-lalla-yogeshwari-anand-koul/page/1/mode/2up. (last accessed on 11 April 2023). p. 15.

১১। Kaul, Jayalal. 1968. *studies in Kashmiri.* Srinagar: Kapoor Brothers., p. 177.

১২। Raina., *op cit.,* p. 18.

১৩। দেশপাণ্ডে, জি. টি., ১৯৯৬, *অভিনবগুপ্ত* (অনু. রত্না বসু), নতুন দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ২২-২৪।

১৪। Kaul. 1997., *op cit.,* p. 5.

১৫। *Ibid.*, p. 26.

১৬। Raina., *op cit.,* p. 18.

১৭। Bazaz, Prem Nath. 1959. *Daughters of the Vitasta : A History of Kashmiri Women from Early to the Present Day.* New Delhi: Pamposh Publications. pp. 129-130.

১৮। Lorenzen, David N. 1991. *Kabir Legends and Ananta-das's Kabir Parachai.* New York: State University of New York Press. p. 41.

১৯। Orr, W.G. 1947. *A Sisteenth-Century Indian Mystic.* London: Lutterworth Press. p. 43.

২০। Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization* (trans. By A.M. Henderson & Talcott Parsons), ed. By Talcott Parsons. New York: The Free Press.

২১। Kaul., *op cit.,* pp. 21-32.

২২। *Ibid.*, pp. 21-22.

২৩। *Ibid.*, p. 17.

২৪। Raina., *op cit.,* p. 16.

২৫। Kaul. 1968., *op cit.,* pp. 181-182.

২৬। Kak, Jaishree. 2007. *Mystical Verses of Lalla: A Journey of Self Realization.* Delhi: Motilal Banarasidass Pvt. Ltd. p. 4.

২৭। *Ibid.*, p. 5.

২৮। Kaul. 1968., *op cit.,* 185.

২৯। Kak., *op cit.,* p. 5.

৩০। Kaul. 1968., *op cit.,* p. 179.

৩১। *Ibid.*, p. 181.

৩২। Kak., *op cit.,* p. 17.

৩৩। Kaul. 1968., *op cit.,* p. 182.

৩৪। Chakravarti, Uma. 1993. *Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, Caste, Class and State.* In Economic and Political Weekly, Apr. 3, 1993, voi. 28, No. 14., https://www.jstor.org/stable/4399556 (Last accessed on 5 April 2023). p. 579.

৩৫। মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনু.) ১৯০২, *মনু-সংহিতা,* কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ৭৬০।

৩৬। তদেব, পৃ. ৭৬৪

৩৭। Chakravarti., *op cit.,* pp. 582-583.

৩৮। Ramaswamy, Vijaya. 2007. *Walking Naked: Women, Society, Spirituality in South India* (First Published 1997). Shimla: Indian Institute of Advanced Study. P. 10.

৩৯। *Ibid.*, p. 17.

৪০। Kak., *op cit.* p. 5.

৪১। Koul., *op cit.* pp. 29-30.

৪২। Ramaswamy., *op cit.* pp. 19.

৪৩। *Ibid.*, p. 13.
জুলিয়া ক্রিস্তেভা জাক লাঁক-এর মতানুসারী হয়ে ‘সিম্বলিক’ বলতে ভাষার রাজ্যকে বুঝেছেন। ভাষা কোনো প্রাকৃতিক বিষয় নয়। নিয়ম-নীতি খাটিয়ে মানুষ একে তৈরি করেছে। মানুষের মন এই ভাষার রাজ্যে বিচরণ করে। লাকঁ-র মতে মানুষের মন ‘সিম্বলিক’ ছাড়াও আরও দুটো স্তরে যাতায়াত করতে পারে। ইমেজের রাজ্য ‘ইম্যাজিনারি’-তে ও ‘রিয়েল’-এ। রিয়েল সেই আত্মসত্তা যা প্রাকৃতিক কামনা, শারীরিক চাহিদা দিয়ে তৈরি। রিয়েলকে অনুভব করা যায়, কিন্তু ‘সিম্বলিক’ ভাষার রাজ্য এনে তাকে বর্ণনা করা যায় না। ‘সেমিওটিক’ বলতে ক্রিস্তেভা ব্যক্তির এই ‘রিয়েল’ আত্মসত্তাকেই বোঝান।

৪৪। Kak., *op cit.* p. 17.

৪৫। সেনশর্মা, দেবব্রত, ২০২১, *কাশ্মীর শৈবদর্শন (প্রথম প্রকাশ ২০১৬),* কলকাতা : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

৪৬। Raina., *op cit.* pp. 23-24.

৪৭। Kak., *op cit.* p. 3.

৪৮। Kaul. 1973., *op cit.* p. 26.